দ্বিতীয় অধ্যায়

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন পরিক্রমা

ভ্রমণ সাহিত্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এখনও তেমন কোনো হইচই বড়ো একটা চোখে পড়ে না বললেই চলে। সাহিত্যের ইতিহাসে ভ্রমণ কাহিনি গুরুত্ব সেভাবে না পেলেও বিশ্বের আর্থ সামাজিক পরিবর্তনে, রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনে ভ্রমণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে একথাও ঠিক যে, এই সব গুরুত্বের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে কেউই ভ্রমণে উৎসাহী হন না মানুষ বরাবরই যাত্রা করেছে অজানার খোঁজে, নিজের মনের তাগিদে। প্রাচীন ও মধ্যযুগেও দেখা গেছে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদেরা, বিভিন্ন লোককবিরা নানা জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন কখনও নিছক ঘোরার উদ্দেশ্যে, কখনও বা ধর্মবিস্তারের উদ্দেশ্যে। এখনও মানুষের এই যাত্রা স্থিতিপ্রাপ্ত হয়নি। আর হয়নি বলেই আমরা বিভিন্ন জায়গার হদিশ পাই বিভিন্ন ভ্রামণিকদের ভ্রমণ কাহিনি পড়ে। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ধারাটি যথেষ্ট ঋদ্ধ। চর্যাপদের সাধক কবি থেকে শুরু করে আধুনিক কালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বর্তমানে নবনীতা দেবসেনের ভ্রমণ কাহিনির যে ধারাটি ক্রমশ বলিষ্ঠ হয়েছে সেই ধারার এক উল্লেখযোগ্য বাঁক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০২- ১৯৯৭)। যদিও বাংলা সাহিত্যে বেশীরভাগ লেখক সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি ভ্রমণ কাহিনিও লেখেন, কিন্তু অনেকে খ্যাত শুধুমাত্র ভ্রমণ কাহিনি লেখক হিসাবেই— যাঁদের মধ্যে অন্যতম 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই সুপুত্রটি— উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ইংরাজী ১২ই অক্টোবর ১৯০২ বাংলা ১৩০৯ সনের ২৬ শে আশ্বিন। দিনটা ছিল বিজয়া দশমী। সারা বাংলা জুড়ে যখন দুগ্গা মা এর বির্সজনের বিষন্ন সুর, সেই তিথিতেই কলকাতায় ভবানীপুর, ৭৭ নং রসারোড, বর্তমানে আশুতোষ মুখার্জ্জী রোডের বাড়ির দোতলার পূর্বদিকের কোণের একটি ছোট্ট ঘরে (তার নাম আঁতুর ঘর) গঙ্গাঁপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষের তৃতীয় পুত্র উমাপ্রসাদ জন্ম নেন। বিজয়া দশমীর দিনে জন্ম হয়েছিলো বলে তাঁর ডাক নাম হয় বিজু। আশুতোষ যোগমায়ার সাতটি সন্তান- কমলা, রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ, অমলা, বামাপ্রসাদ এবং রমলা। চারটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। মা যোগমায়া দেবী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী ও সুরুচি সম্পন্না প্রগতিশীলা নারী - যাঁর প্রভাব তাঁর সন্তানদের উপর অবধারিত ভাবেই বর্ষিত হয়েছিল। উমাপ্রসাদও শিশুকালে অত্যন্ত সুন্দর দেখতে ছিলেন। তিনি নিজেই তা 'ছেলেবেলাতে' নানা গল্পের ছলে বলেছিলেন:

> "সকালবেলা পেরাম্বুলেটারে আমাকে চড়িয়ে বাবা বেড়াতে বেড়িয়েছেন। নিকটেই স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। বাবার শুভানুধ্যায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কচি শিশুর টুকটুকে রঙ্, মাথা ভরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল (এখানকার এই টাক মাথাতে তখন নাকি তাই ছিল)। গুরুদাসবাবু দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন, জিজ্ঞাসা করেন, ছেলে, না মেয়ে? বাঃ

চমৎকার সুশ্রী হয়েছে ত! বাবা বলেন, ছেলে। তিনি বিশ্বাস করতে চান না। আদর করে কোলে তুলে নেন, জাঙিয়া তুলে দেখেন।" [১]

দেখতে সুন্দর হলে কী হবে? উমাপ্রসাদের শরীর স্বাস্থ্য কোনোদিনই তেমন ভালো ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে টাইফয়েডে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। রোগা পাতলা এই ছেলেটির ডানপায়ে চেটোর কাছে 'কাউর ঘা' হয়। এই সবের জন্য তাঁর গলায় ঠাকুরের মাদুলি ঝুলত। ঠাকুমা জগত্তারিনী দেবী তাঁকে নানা ছড়া বলে খেপাতেনঃ

"বিজয়বালা কণ্ঠমালা গলায় মাদুলি
বিজু আমাদের পাড়া কুঁদুলি।"[২]

শৈশবে মায়ের স্নেহ ভালোবাসার নিগঢ়ে ছোটো বোনেদের পুণ্যি পুকুর ব্রত, মামাবাড়ি কৃষ্ণনগরে ছোটো পটুয়াদের সঙ্গে থেকে তাদের নিপুণ হাতের দুর্গা প্রতিমা তৈরীর কাজ দেখে, কচোয়ান, সহিসের সঙ্গে গল্প করে, ছোট্ট বিজুর দিন কাটে। কখনোবা ভবানীপুরের বাড়িতে রাত্রে শিয়ালের ডাক শুনে, আশুতোষের বিলাতী বাজনার গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন উমাপ্রসাদ। আবার কখনোবা বাড়ির পুরানো চাকর রামবরণের কাছে গল্প শুনে তাঁর ভুঁড়ি নাচিয়ে নাচ দেখে উমাপ্রসাদের শিশুকাল কেটে যেতে থাকে।

আশুতোষের বাড়িতে ছিল বিশাল লাইব্রেরী। এর ফলে গ্রন্থসমুদ্রের মধ্যেই ছোট্ট বিজুর জন্ম ও শৈশবের খেলাধূলাও। সেজন্য জন্ম থেকেই বই এর সঙ্গে একটা সখ্যতা জন্মেছিল উমাপ্রসাদের। হাতে খড়ির পর শ্লেটে অ-আ-ক-খ তে দাগ বোলাতে বোলাতে ধীরে ধীরে লিখতে শেখা- তারপর কখনো সাদা কখনোও বা ব্রাউন রঙের হাঁসের পালককে নিব বানিয়ে লেখার অভ্যাস শুরু হয়েছিল। উমাপ্রসাদের হস্তাক্ষর ছিল মুক্তোর মত ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। শেষ বয়সেও তাঁর হাতের লেখার কোনো বিকৃতি হয়নি। বর্ণপরিচয়, 'অজ,আম,ইট', BLA ব্লে, BLE ব্লি, a lame man met a horse, 'রাত্রি পোহাইল উঠ যাদুধন' অথবা 'রামেদের বুধিগাই প্রসব হইল'— এই সব ছড়া তাঁর বালক মনে নানা উদ্দীপনা সৃষ্টি করত। উমাপ্রসাদের শৈশবে প্রথম শিক্ষক ছিলেন প্রিয়নাথ বসু। এঁনার কাছে বর্ণপরিচয়, ফার্ষ্ট বুক পড়তেন। এর পরের পর্বের শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাঁর কাছে পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও অনেক মানবিক গুণের বিকাশ ঘটেছিল উমাপ্রসাদের। ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের মাধ্যমে যে কোন সমস্যাই সমাধান করা যায়— এই পাঠটির শিক্ষা মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে প্রথম অনুভব করতে পারেন আমাদের আলোচ্য লেখক।

উমাপ্রসাদের জন্ম ও বাল্যজীবনের নানা ঘটনা, বংশপরিচয় 'আমার ছেলেবেলা' প্রবন্ধে বিবৃত। উমাপ্রসাদ ছেলেবেলার ঘটনাগুলি সুন্দরভাবে এখানে বর্ণনা দিয়েছেন। নানা বিধিনিষেধ,পরিবারের নানা আচার অনুষ্ঠানের কথাও তুলে ধরেছেন এখানে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই সব বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা যেমন মুখার্জী পরিবারের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হই,তেমনি তৎকালীন সমাজের সুন্দর একটা ছবি আমাদের সামনে ধরা পড়ে । এক জায়গায় উমাপ্রসাদ বলেছেন:

'মনে পড়ে, বাড়িতে সন্তানের জন্মের অষ্টম দিনে আটকৌড়ের অনুষ্ঠানের কথা। সেদিন বিকেলে আমরা ছোটছেলেরা হইচই করে বাড়ি মাতাতাম। আত্মীয়স্বজনের ছেলেরা আসত। ভিতর একতলার উঠানে বড়দের মধ্যে কেউ কুলা হাতে ধরে দাঁড়াতেন । আর ছেলের দল কাঠি নিয়ে সেই কুলার উপর দমাদ্দম্ পিটত, আর ফাটিয়ে চেঁচাত, 'আটকড়াই, বাটকড়াই ছেলে আছে ভাল' দোতলার বারান্দা থেকে মেয়েরা কেউ উওর দিতেন,'ভাল' ।আর তারপর ছেলেরা ছড়ার পরের পদ, কখন নিজেরাই বানিয়ে,চেঁচাতে থাকত,আর উদ্দামভাবে কুলা পেটাত ।সেই মারের ঘায়ে কুলা ভাঙত এবং অবশেষে সেই ভাঙা কুলা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হত। এরপরই ছোট্ট ছোট্ট টুকরি করে প্রত্যেককে আটকড়াই ভাজা, মিঠাই ও পয়সা জলপান স্বরূপ বিতরণ করা চলত।'[৩]

লোকমুখে অনেক ছড়া তখন প্রচলিত ছিল। মুখার্জী পরিবারে বিভিন্ন মেয়েলী ব্রত ও উপাচারের প্রচলন ছিল। সেই সব ব্রতের মন্ত্রগুলি শিশু উমাপ্রসাদের মনকে বড় টানত। যেমন,

'পুণ্যিপুকুর পুস্পমালা। কে পূজেরে দুপুরবেলা। আমি সতী লীলাবতী। সাতভেয়ের বোন ভাগ্যবতী। স্বামীর কোলে পুত্র দোলে। মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গাঁজলে'। [৪]

প্রতি নারীর এই একই কামনা।

'গোকুল গোকুলে বাস গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস আমার যেন হয় স্বর্গে বাস। তোমাকে ঘুরিয়ে পাখা আমার হাতে হোক্ সোনার শাঁখা।'[৫]

এ নারীর চিরন্তন অভিলাষ। এই ছড়াগুলি ছেলেবেলায় শুনলেও অনেক বড় হয়েও লেখকের মনের মণিকোঠায় ভাস্বর হয়ে আছে।

সেকালে কোলকাতার রাস্তায় ট্রামের ঘন্টা কীভাবে লেখকের বাল্যমনে ঝঙ্কার তুলত, মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা বড় বড় হোস্ পাইপ দিয়ে কেমন ভাবে রাস্তা ধুয়ে দিত- এরকম আপাততুচ্ছ ঘটনাগুলিও লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। ছেলেবেলায় সার্কাস দেখার কথা, শরীর চর্চা, খেলাধূলা, পশুপ্রেম সবেরই বিবরণ দিয়েছেন এখানে।

এই প্রবন্ধে তিনটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন উমাপ্রসাদ। একবার ১৯১১ সালের বিজয়াদশমীর দু'-একদিন পড়ে বাড়ির নতুন চাকর ঘরে গ্যাসের বাতি জ্বালাতে গিয়ে গ্যাস লিক করে সারা গায়ে আগুন ধরে মারা যায়। এই হৃদয়বিদারী ঘটনা উমাপ্রসাদের মনে গভীর দাগ কেটে যায়।

উমাপ্রসাদের দিদির বিয়ে হয়েছিল (১৯০৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রের সঙ্গে। কিন্তু পরের বছরই দিদি বিধবা হন (১৯০৫)। এরপর আশুতোষ মেয়েকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন ব্রজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলালের সঙ্গে ১৯০৮ সালে। কিন্তু দুভার্গ্যবশত ১৯০৯ সালে হঠাৎ করে সেই জামাইবাবুও মারা যান। সারা বাড়িতে এক অসাধারণ শোকের পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। সেই শোকাবহ পরিস্থিতিতে লেখকও ছেলেবেলায় কেঁদেছিলেন।

শৈশবে আরও একটু মুত্যু লেখকের বাল্যমনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল- তা হল, এই চড়াই পাখির মৃত্যু। ঘরের আয়নায় চড়াই পাখিটা ধাক্কা খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে। লেখক অনেক যত্ন করে বাঁচানোর চেষ্ঠা করলেও তা বৃথা যায়। এরপর কাঠি সাজিয়ে চিতার উপর পাখিকে সৎকার করে শোকাতুর শিশুমন সান্তনা খোঁজার চেষ্টা করে। উমাপ্রসাদ ছেলেবেলা থেকে কত নরম মনের মানুষ ছিলেন তা এইসব ঘটনা থেকে জানা যায়। ভ্রামণিক ব্যক্তিজীবনেও ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

১৯০৯ সালে সাত বছর বয়সে উমাপ্রসাদ ভর্তি হলেন ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশনে। ধুতি-কাপড়-জামা পড়ে শ্লেট হাতে উমাপ্রসাদের স্কুল যাতায়াত শুরু হল। এখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু, এছাড়াও ছিলেন বিশাল চেহারার নগেনবাবু, যিনি নানা রকম দৈহিক নির্যাতন করে ছাত্রদের আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলেন। আর ছিলেন দুই যতীন বাবু, একজন ফর্সা ও অন্যজন কালো । এই 'কালো' যতীন বাবু ছিলেন বৈষ্ণব ও অত্যন্ত ভালোমানুষ। তাঁর স্নেহধারায় ছাত্ররা সিক্ত হয়েছিল। এরই মধ্যে ১৯১১ সালে উমাপ্রসাদের উপনয়ন হয়। ১৯১৯ সালে উমাপ্রসাদ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে। এজন্য জয়নারায়ণ ও নবীনচন্দ্র কুন্ডু প্রাইজ এবং সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর পাবার জন্য নবকৃষ্ণ কর পদক পান এবং মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি পান। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশকৃষ্ণ দে প্রমুখেরা তাঁর সতীর্থ ছিলেন। এরপর ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ পরীক্ষায় প্রথম হন। এই পরীক্ষায় বাংলা রচনায় দক্ষতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য পদক, ভাষা ও অঙ্কে ভালো নম্বর পাবার জন্য ডাফ বৃত্তি, বাংলার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বৃত্তি ও পারিতোষিক, ইংরাজি ও অঙ্কের জন্য সারদাপ্রসাদ পুরস্কার এবং প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য স্টিফেন ফিনে পদকপ্রাপ্ত হন। এরপর ঐ কলেজ থেকেই ১৯২৩ সালে ইংরাজীতে অর্নাস নিয়ে বি.এ পাশ করেন প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে, এবারও বাংলা রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক, ইংরাজির জন্য জুবিলি বৃত্তি, প্রথম স্থানাধিকরণের জন্য মানেকজী রুস্তমজি স্বর্ণপদক ও তাওনি স্মারক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বৃত্তির যাবতীয় অর্থ তিনি তুলে দিলেন দিদি কমলার হাতে।

নিজের বিষয় থেকে সরে গিয়ে এরপর Ancient India History and Culture এর নতুন গ্রুপ Fine Arts এ ললিতকালায় এম. এ পড়বেন বলে পিতার মতামত চাইতে যান। অনুমতি মেলে। আশুতোষ বলেও দেন কী ধরণের বই পড়তে হবে এবং বইগুলো তার লাইব্রেরীর কোন্ শেল্‌ফে আছে। ১৯২৫ এ 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' তে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর আইন পড়া শুরু করেন এবং বি. এল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে সপ্তম স্থান দখল করেন ১৯২৮ এ।

পড়াশুনোর পাশাপাশি নানা ঘটনা তাঁর বাল্যজীবনকে আলোড়িত করেছে। আশুতোষ নিজে মুগুর ভাঁজতেন, ব্যায়ামচর্চা করতেন। স্বভাবতই তিনি চাইতেন তাঁর সন্তনেরাও স্বাস্থ্যচর্চা করুক এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হোক। কুস্তি, ব্যায়াম, ডামবেল, মুগুর ভাঁজা, টেনিস, ফুটবল, সব ব্যাপারেই উমাপ্রসাদের প্রবল আগ্রহ ছিল। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর মামাতো ভাই অবনীর কাছ থেকে যথেষ্ঠ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। স্বাস্থ্যচর্চা ও

খেলাধূলোয় তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। 'আমার ছেলেবেলা' তে লেখক নিজেই জানিয়েছেন: 'খেলাধূলায় আমার যা কিছু আর্কষণ ও ব্যায়াম করায় উৎসাহ অনেকখানি তারই সংসর্গের ফলে'। [৬]

তবে অবনীর মত সাজগোজের ব্যাপার ছিল না উমাপ্রসাদের। সবার চুল ছাঁটা থাকত সামনে ছোটো ছোটো করে অনেকটা কদম ছাঁটের মত। গায়ে কোট আর ছোট্ট ধুতি। পায়ের শু জুতো বেঢপ নৌকার মত—ফিতে বাঁধা ছিল না। অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষা ও চটক্‌দারহীন জীবনযাপনে অভ্যস্থ ছিলেন উমাপ্রসাদ —সেই ছোটো বেলা থেকেই। চা-পান-সুপারি ইত্যাদির কোনো নেশাই ছিল না তাঁর। সে সময়ে মুখার্জ্জী বাড়িতে 'চা' ঔষধ বলে গণ্য করা হত। কারোর জ্বর, ঠান্ডা লাগলে তাকে আদার রস দিয়ে চা বানিয়ে দেওয়া হত।

ছেলেবেলায় উমাপ্রসাদ মা ও দিদির কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ শুনতেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের দল বাড়িতে এসে নাচ দেখিয়ে যেত। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসবে 'গোপী' সেজে এসে ছেলেমেয়েরা নাচ দেখাতে এলে উমাপ্রসাদরা ছুটে যেতেন বইখাতা ফেলে। এই সব অনুষ্ঠান উমাপ্রসাদদের এক কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যেত। উমাপ্রসাদের ছেলেবেলার গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার বেশ খানিকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। এঁরা দুজনেই ছাদে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতেন। একের পর এক মেঘের ভেলা চলে যেত। সেই মেঘের মালা গেঁথে গেঁথে নানা আকার তৈরী করতেন- তা কখনো পাহাড়, কখনো সমুদ্র, কখনো নানা আকৃতির পশু পাখি মানুষ ইত্যাদি।'আমার ছেলেবেলা' -তে লেখক নিজেই জানিয়েছেন তার মেঘ ভ্রমণের গল্প ঃ

> 'ঐ ছাদই ছিল আমার ছেলেবেলার বিচরণ ক্ষেত্র। একা একা সেখানে ঘুরে বেড়ানো। এধার থেকে ওধারে ছোটা। লম্বা শ্বেত পাথরের সীট- এ বসে আকাশে মেঘের মধ্যে পাহাড়, পর্বত, নদী, হ্রদ, কতো জীবজন্তু পশুপক্ষী মানুষের বিভিন্ন আকারের রূপ দেখা। কল্পনার রথে চড়ে সেই মেঘ রাজ্যে ভ্রমণ করা। আজ ভাবি, তখনি কি আমার ভ্রাম্যমান জীবনের হাতে খড়ি। কেন না, পরে বড় হয়ে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরতে সেই ছেলেবেলায় মেঘের রাজ্যে দেখা আকাশ কুসুমের অনেক দৃশ্যের প্রকৃতই প্রতিচ্ছবি দেখি হিমালয়ের বুকে! দেখে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।' [৭]

উমাপ্রসাদের বাড়িতে পূজার্চনা হত। বারো বছর দুর্গাপূজাও হয়েছিল। দুর্গাপূজা নিয়ে ভীষণ রকম মাতামাতি ছিল উমাপ্রসাদের। এসবই বর্ণিত হয়েছে 'হিমালয়ের পথে পথে' গ্রন্থে।

খুব ছেলেবেলাতেই উমাপ্রসাদ বিষাদের মুখোমুখি হন। উমাপ্রসাদ প্রথম মৃত্যুর ঘটনার সম্মুখীন হন মাত্র সাত বছর বয়সে, দিদি কমলা বিধবা হন। কিছুদিন পর এই দিদির পুনর্বিবাহ হলেও সেই বিবাহিত জীবন দিদির স্বামীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চিরতরে অপূর্ণ থেকে যায়। আরো একটি মৃত্যু ঘটনা উমাপ্রসাদের মনে গভীর ভাবে দাগ

কেটে যায়— একটি চড়াই পাখির মৃত্যু দৃশ্য। কাঁচে ধাক্কা খেয়ে একটি চড়াই পাখি মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং তারপর মৃত পাখিকে চিতা সাজিয়ে দাহ করা হয়। ছোট্ট পাখিকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলে শিশু উমাপ্রসাদের। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টাই বৃথা হয়ে যায়। এভাবে নানা ছোট্ট ছোট্ট ঘটনামালা নিয়ে সাজানো উমাপ্রসাদের কিশোর জীবন।

এর মধ্যেই উমাপ্রসাদের ভ্রমণের হাতে খড়ি হয়ে যায়। ঠাকুরদাদা গঙ্গাঁ প্রসাদ মধুপুরে যে বাড়ি বানিয়েছিলেন সে বাড়ি তৈরীর আগেই ১৯১২ সালে উমাপ্রসাদ সেখানে ঘুরতে যান। এরপর ১৯১৬ তে আশুতোষের সঙ্গী হয়ে উমাপ্রসাদ যান এলাহাবাদ,বিন্ধ্যগিরি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৭ তে বম্বে, পুনা, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা- সহ্যাদ্রি। ১৯১৮তে মহীশূর, উটকামন্ড এইসব বেড়াতে যাওয়া আশুতোষের সঙ্গেই। ১৯১৯ এ প্রথম দেখলেন হিমালয়কে দার্জিলিং থেকে। বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন উমাপ্রসাদ। এতদিন মনে যা যা কল্পনা করেছিলেন তার চেয়েও বহুগুণ প্রাপ্তিতে উমাপ্রসাদ বিভোর হয়ে গেলেন। যাইহোক, তাঁর ভ্রামণিক জীবন নিয়ে আলোচনা অন্যত্র হবে। ভ্রমণের পাশাপাশি পড়াশুনো শেষে আইন পাশ করে ল' কলেজের অধ্যাপনাকে চাকরি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। জীবনের প্রথম ল' ক্লাসে একটি ছাত্রের মুত্যু (সুকুমার) তাঁকে গভীরভাবে শোকাহত করে। ছাত্রটির কথা 'অ্যালবাম পুনশ্চ' তে 'নিয়তি' নামে লেখক লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর ল ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ বাগ্‌চি। উমাপ্রসাদ সম্পর্কে বারিদবরণ ঘোষ মহাশয়কে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ডঃ চন্দ্র জানিয়েছেনঃ 'অধ্যাপনার সময়ে ছাত্রদের যথেষ্ট স্নেহসিক্ত মন দিয়ে দেখতেন।' প্রয়াত অরুণ বাগ্‌চিও তাঁর সম্পর্কে বলে গেছেন ঃ

> 'প্রথমদিন তাঁর ক্লাসে বসে তার লোকচার যতটা মন দিয়ে শুনেছি তার চেয়েও বেশী মনোযোগ দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করেছি অনেকখানি কৌতুহল নিয়ে। ..... সিনিয়ার ছাত্রদের কাছে শুনেছি অধ্যাপক হিসাবেই তিনি বড় কড়া, অসম্ভব মেজাজী, পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষা নেই। তাছাড়া সর্বদা মুখ হাঁড়ি করে তিনি বসে থাকেন। কথাবার্তায় রস কম, কষ বেশী ইত্যাদি। শুনেই মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই ভদ্রলোক খুব ডিসিপ্লিন মানা মানুষ অভিজ্ঞতা হল যখন, দেখলাম সত্যিই উমাপ্রসাদ গুরুগম্ভীর রাশভারি মানুষ। তাঁর চলাবলা থেকে যেন আভিজাত্যের আলো ফুটে বের হয়। সত্যিই তিনি ছাত্রদের কাছে সেই একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা আশা করেন যা আমার অভিজ্ঞতায় কলকাতার কলেজগুলির মধ্যে একমাত্র প্রেসিডেন্সিতে মিলত তখন। আইন কলেজে মোটেই সেই আবহাওয়া ছিল না।' [৮]

উমাপ্রসাদ আত্মগম্ভীর হলেও তাঁর রসবোধ ছিল যথেষ্ঠ। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিয়মশৃঙ্খলা বোধও ছিল অত্যন্ত বেশী। একবার উমাপ্রসাদ ক্লাসে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ও এক ছাত্রীর দৃষ্টিকটু কথোপকথন ও হাসাহাসির বিরোধিতা করেছিলেন এবং দু'জনকে আলাদা বসার নির্দেশ দিলে ছাত্রছাত্রীদুটি হাইকোর্টে উমাপ্রসাদের নামে মামলা করেন। মামলাটি মুরারি চ্যার্টাজ্জী শিবানী সেনগুপ্ত মামলা নামে পরিচিত। মামলাটি

উমাপ্রসাদই যেতেন। কারণ ক্লাসের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যেহেতু অধ্যাপকের , সেজন্য উমাপ্রসাদের পক্ষেই রায় বেরোয়। কিন্তু ঘটনাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তিনি তাঁর অধ্যাপনা থেকে অবসর নিলেন ১৯৫২ সালে। যে অধ্যাপনাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন সেই কাজকে কখনোই ভ্রষ্ট হতে দিতে চাননি তিনি।

অধ্যাপনার আগে উমাপ্রসাদ বেশ কয়েকটি চাকরি পেয়েছিলেন । আলিপুর কোর্টেও বেশ কিছুদিন চাকরি করে ছিলেন ১৯৩০ থেকে। পরে হাইকোর্টেও যোগ দেন। কিন্তু বাঁধাধরা চাকরি ভালো লাগেনি তাঁর। ছেড়ে দিলেন সেই ওকালতিও। বৃটিশদের গোলামি তিনি করবেন না, তাই অনেক চাকরির প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন জীবনে। All Bengal Textile Association এর সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন দাদা শ্যামাপ্রসাদের পীড়াপীড়িতে। এখানকার যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্বে ছিলেন উমাপ্রসাদ। কিন্তু এখানকার দুর্নীতিকে তিনি মেনে নিতে পারলেন না। এ চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে যোগ দিলেন বিড়লা কোম্পানির লিগাল অ্যাডভাইসার হিসাবে। কিছুদিন পর এ চাকরিতেও ইস্তফা দিলেন তিনি। পরে বেঙ্গল লাইব্রেরীর এসোসিয়েশনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে এখানকার আর্থ দপ্তরের কাউন্সিল মেম্বার ও চেয়ারম্যান পদে বহাল হন। ১৯৩৮ এখানকার মেম্বারশিপ সাব কমিটির চেয়্যারম্যান মেম্বার ছিলেন। পরে এই প্রতিষ্ঠানের লিকুইডেটারও ছিলেন। এখান থেকেই তাঁর কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরমধ্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ট্যাবুলেটারের কাজেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

শুধুমাত্র ওকালতি নিয়েই তিনি জীবন কাটিয়ে দেননি। এই মহান মানুষটির পদচারণা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই। এককথায় তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তবে একথা ঠিক, এই প্রতিভাধর মানুষটির মানসিকতা ও চিন্তাভাবনার বিকাশে তাঁর পিতা আশুতোষ ও মা যোগমায়া দেবীর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। উমাপ্রসাদের ভ্রমণের অনুপ্রেরণার মূলে ছিলেন কিন্তু আশুতোষ। আশুতোষ ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সন্তানদের স্বাস্থ্যচর্চা ও খেলাধূলার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। উমাপ্রসাদরা বালকবেলায় বাড়ির দারোয়ান দেওকরণ দুবের কাছে যথেষ্ট ভালোভাবে কুস্তি শিখেছেন। তাঁর কুস্তির গুরু ছিলেন পূর্ণচন্দ্র মুখার্জ্জী। শৈশবে আশুতোষের ব্যায়ামের জিনিসপত্র ছিল উমাপ্রসাদের খেলার সামগ্রী। লেখক নিজেই 'আমার ছেলেবেলা'তে এক ঘটনার কথা বলেছেন ঃ

> "বাবার ব্যবহৃত গুলি ছিল অস্বাভাবিক ভাবে যেমন বিরাটাকার, তেমনি ভারী। তাঁর সেই কাঠের মুগুরের ভেতরে ছিল লোহার ভারী রড, তাই তাকে মুগুর না বলে ভীমের গদা বলাই উচিত। .....ছেলেবেলায় সেই ডাম্‌বেল মেঝে থেকে এক ইঞ্চিও তুলতে পারা সম্ভব ছিল না, গড়িয়ে গড়িয়ে সবাই মিলে নিয়ে যেতাম ছাদে। সেখানে ছাদের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গড়িয়ে বা দড়ি বেঁধে গাড়ির মত হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া ছিল আমাদের মহাস্ফূর্তির খেলা। সেই জগন্নাথের নকল রথের চাকার উদ্দাম গতি ঘড় ঘড় করে প্রচন্ড শব্দ

তুলত, সারাবাড়ি কাঁপত, ঠিক নীচে তিন তলায় বাবার বসবার হল— এর প্রকান্ড জানলাগুলির সব কাঁচ ঝনঝন শব্দ তুলে আপত্তি জানাত । একদিন বিকেলবেলা। সঙ্গীদের নিয়ে এই খেলায় আমি মত্ত। বাড়ীতে বড়রা কেউ নেই। বাবা ফিরবেন সেই সন্ধ্যার পর। তাই, নিশ্চিন্ত মনে মহা উৎসাহে সেই ডাম্‌বেল টানতে টানতে ছাদের এধার ওধার ছোটাছুটি চলছে— এমন সময়ে বিনামেঘে বজ্রপাত। সে কী ভীষণ হুঙ্কার! এক নিমেষেই সবাই যেন বজ্রাহত হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে যাই। দেখি, সিঁড়ির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাবা। হাতে সেই মুগুর— সব কটার এই দিয়ে মাথা ভেঙে দেব, হচ্ছে কী সারাবাড়ি কাঁপিয়ে। "- সেই বজ্র ধ্বনি আজও মনে হলে বুক কাঁপে। আর তখন ? কার মুখে কথা ফোটে! সবাই মাটির পুতুল! বুকের ভিতরে দুরুদুরু।

কিন্তু, হঠাৎ তখনি আবার সব শান্ত। বিদ্যুৎচমকের মত তাঁর দু চোখের আগুন গেছে নিভে, গুরুগম্ভীর অথচ, স্নেহার্দ্র কণ্ঠে আদেশ করেন, যা-ও সক্কলে নীচে নেমে। খুব খেলা হয়েছে। ডামবেল নিয়ে আর কখনো অমন করে খেলবে না।"[৯]

গুরুগম্ভীর হয়েও আশুতোষ অত্যন্ত স্নেহবৎসল। সন্তানদের খেলতে বারণ করেননি কখনো, কিন্তু খেলতে গিয়ে কোনো অহিত যাতে না হয়ে যায় তার দিকে নজর রেখেছেন সর্বদা।

উমাপ্রসাদ টেনিস খেলতে খুবই ভালোবাসতেন, হরিশ পার্কে নিয়মিত টেনিস প্রাক্টিস করতে দেখা যেত তাঁকে। ব্যাকহ্যান্ড সার্ভিস ও পাসিংশটে দারুণ দক্ষতা ছিল তাঁর, টেনিস খেলার পোশাকে তিনি যেমন খেলতেন তেমনি ধুতি মালকোঁচা মেরে টেনিস শু পরেও টেনিস খেলতেন। হাইকোর্ট ক্লাবেও তিনি খেলতেন। সুশীলরঞ্জন ঘোষ, স্যাচাইন ব্যানার্জ্জী, খসু সেন, নসু সেন প্রমুখেরা তাঁর খেলার সঙ্গী ছিল।

তিনি Bengal Lawn Tennis Association (BLTA) এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ফুটবল খেলতেও তিনি খুব ভালবাসতেন। মোহনবাগান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস ক্লাব এর সদস্য ছিলেন। তিনি রেফারি ট্রেনিং নিয়ে I.F.A থেকে পাশ করেন ১৯৩২ সালে এবং পরবর্তীতে রেফারি অ্যাসোসিয়েশানের অ্যাক্রেডিটেড সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং ক্লাব প্রতিষ্ঠার মুখ্য ভূমিকা এবং উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। ১৯৩৪ এ প্রতিষ্ঠিত ঢাকুরিয়া লেকের রোয়িং ক্লাবের সদস্যও ছিলেন তিনি।

শুধুমাত্র ফুটবল বা টেনিসেই নয়, যে কোন খেলাই তাঁর পছন্দের ছিল। ক্যারাম থেকে শুরু করে তাস, ক্রিকেট সবতাতেই যথেস্ট উৎসাহ ছিল তাঁর। ১৯৪১ সালে একবার মোহনবাগানের খেলায় তাদের উৎসাহ দিতে মাদ্রাজেও চলে গিয়েছিলেন তিনি এবং মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হলে তা নিয়ে যথেষ্ট মাতামাতিও ছিল তাঁর, অত্যন্ত খেলোযার সুলভ মন ছিল তাঁর। খেলাধূলোর মধ্যে দিয়ে যাতে ছেলেমেয়েদের মানসিকতার বিকাশ হয়, সবসময়েই তাই- ই চাইতেন তিনি।

উমাপ্রসাদ সংগীতপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁর স্কুল শিক্ষক 'কালো' যতীন বাবু (ইনি পরে গৃহশিক্ষকও হন) উমাপ্রসাদের মনে সংগীতের মাধুর্য সম্পর্কে অবহিত করে। ছেলেবেলায় ক্লাসে যতীনবাবু অনেক সময়েই অঙ্ক ক্লাসের পরে ঘরের ঘরে দরজা বন্ধ করে ছাত্রদের কীর্তন শোনাতেন। এই গান শুনেই ধীরে ধীরে উমাপ্রসাদের সংগীতের দিকে আর্কষণ বাড়তে থাকে, বিশেষত কীর্তনের দিকে। তবে উচ্চাঙ্গ সংগীত, রবীন্দ্র সংগীতে, শ্যামাসংগীত, দ্বিজেন্দ্র গীতি সবেতেই তাঁর একটা ভালো লাগার জায়গা ছিল। তাঁদের বাড়িতেও কীর্তনের পরিবেশ ছিল। চড়ক, জন্মাষ্টমী, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবে নানা অনুষ্ঠান হত- নাচ, গানের সঙ্গে কীর্তনও হত। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই কীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রও এই অনুষ্ঠানে আসতেন গান গাইতে। নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, ডঃ ইন্দুমাধব বসু, ভূপেন বসু, রামদাস বাবাজী, প্রত্যেকেই এই কীর্তন উৎসবে যোগ দিতেন, প্রচুর লোক সমাগম হত এই অনুষ্ঠানে। উমাপ্রসাদ ও তাঁর বোন অমলাও হারমোনিয়াম সহযোগে এই সংকীর্তনে গান পরিবেশন করতেন।

সদারং সংগীত সম্মেলন, তানসেন সংগীত সম্মেলন, ডোভার লেনের মিউজিক কনফারেন্স এইসব বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানে সারারাত উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনতেন। রমাপ্রসাদের বন্ধু দিলীপ কুমার রায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। গান শুনতে শুনতে তাঁর চোখ জলে অবরুদ্ধ হয়ে যেত। প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯২৩ সালের প্রতিষ্ঠা দিবসে দিলীপ কুমার রায়ের গলায় হিন্দি গানও শুনেছেন, তাঁর ভাগ্নী এষা ও শিষ্যা ইন্দিরা দেবী, সাহানা দেবীর কাছে গান শুনতে যেতেন বার বার। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরিবারেও যাতায়াত ছিল তাঁর। চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তীদেবী উমাপ্রসাদকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এঁদের কন্যা অপর্ণাদেবীর গানও শুনতেন উমাপ্রসাদ। এই সঙ্গীত ছিল তাঁর ভ্রমণের পথের পাথেয়। এই ভাবে জীবনে তিনি বহু বিশিষ্ট গুণী মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। সঞ্চিত হয়েছে ভুবনজোড়া স্পন্দনের অনুভূতি। তাঁর লেখালেখির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সেই স্পন্দন সেই অনুভূতি- স্বাভাবিক ভাবেই, সঙ্গত কারণে।

উমাপ্রসাদের ভিতরে এক শিল্পীসত্তা সবসময়তেই সুপ্ত ছিল। তিনি ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। তাঁর হাতের আঁকা বেশ কিছু ছবিও ছিল, উমাপ্রসাদ Indian Socity of Oriental Arts এর সদস্য ছিলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল উমাপ্রসাদের। অবনীন্দ্রনাথের হাতের লেখা 'চিত্র পরিচয়' এর পাণ্ডুলিপি উমাপ্রসাদের কাছে ছিল। 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্রদ্বয় মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুমতিতে রূপা প্রকাশনা থেকে ১৯৬২ সালে নতুন সংস্করণ যখন বের হয় তার 'পূর্বাভাষ' লেখেন উমাপ্রসাদ । অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

> "বক্তৃতা তো নয়, সে-ও এক ছবি দেখা দীর্ঘ । দেহ বক্তার পরণে আলখাল্লার মত পোশাক। যেন বাংলার বাউল। সুপ্রশস্ত ললাট। মাথার সমুখপানে বিরল কেশ। পাশে ও পিছনে কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছ। যেন নদীতটে স্তব্ধ ঢেউয়ের সারি। চোখের চাহনি, মুখের ভঙ্গী,

অঙ্গচালনা দেহভঙ্গিম সব কিছুর মাঝে কেমন যেন এক অদ্ভুত ভাব। মনে হয়, কৌতুকময়, ব্যঙ্গসূচক অভিব্যক্তি, আপনভোলা মন। এত লোকের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন। যেন ভিন্ন কোন্ এক জগতের মানুষ। ভাবের আকাশে ভেসে ওঠে সুনির্মল স্বচ্ছ জলধারা। সুস্পষ্ট, মধুর অথচ উচ্চকণ্ঠ বাণী। ভাব ও ভাষার অপূর্ব তরঙ্গমালা। গতানুগতিক বাক্যরচনা নয়। শব্দের বিচিত্র বিন্যাস। অপরূপ বলার ভঙ্গী। জনাকীর্ণ নিস্তব্ধ ভবনে সুরময় ধ্বনির তরঙ্গায়িত কম্পন। শ্রোতার কানে মনে ছন্দের ঝঙ্কার ওঠে। বক্তৃতা শোনা নয়, —এ যেন শব্দ ও কথা দিয়ে আঁকা ছবির পর ছবি দেখা। আনন্দের শ্রোতে মন ভেসে চলে কোন্ অজানা অসীম নীল সাগরে। আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে শ্রোতার অন্তর।"[১০]

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে উমাপ্রসাদের চিঠির আদান প্রদানও ছিল।

নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। উমাপ্রসাদ শিল্পকে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি শিল্পীর কদরও জানতেন। অবশ্য মুখার্জ্জী পরিবার বরাবরই গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার যশোহর জেলার দক্ষিণ ডিহির শিল্পী কৃষ্ণভূষণ রায়চৌধুরীর পুত্র এবং হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র এবং নন্দলাল বসুর সহপাঠী। আশুতোষ এই দেবীপ্রসাদকে মিত্র ইনস্টিটিউশানে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। দেবীপ্রসাদের মূর্তির প্রর্দশনী দেখতে যেতেন উমাপ্রসাদ। দেবীপ্রসাদের হাতে আঁকা ছবিও উমাপ্রসাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল।

শিল্পী গোপাল ঘোষও উমাপ্রসাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ছবি আঁকার প্রেরণা গোপাল ঘোষ উমাপ্রসাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। দু:স্থ গোপাল ঘোষকে নানাভাবে সাহায্য করতেন উমাপ্রসাদ। গোপাল ঘোষের বেশ কিছু ছবি সংরক্ষিত ছিল উমাপ্রসাদের সংগ্রহে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্টেলা ক্রামরিশের স্নেহভাজন উমাপ্রসাদ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল। এই দুই মনীষীর মনের আদান প্রদান ঘটে নানা চিঠির মাধ্যমে। পাঠকদের সেই সব চিঠির বক্তব্য পেশ করার এই গুরু দায়িত্ব নিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ। এই প্রবন্ধে অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে যা পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালির এবং বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর নিজে জাতিগত সূত্রে বাঙালি না হলেও বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি পান। কিন্তু তাঁর নিজের বিষয় ছাড়াও দর্শন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি প্রচুর বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্য ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি নানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বংঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলেন। এই সূত্রে তাঁদের নানা ভাবের আদান প্রদান চলতে থাকে বিভিন্ন চিঠির মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙলার জনমানসে যে বিপুল কলরোল সৃষ্টি হয়েছিল তা

এই দুইজনের চিঠির মধ্যে ধরা পড়ে। তৎকালে নানা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এঁরা মতবিনিময় করেন- যা পড়ে পাঠকমনন ঋদ্ধ হয়।

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে একত্রিশটি এবং রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে আটখানি পত্র দিয়েছিলেন। পত্রগুলিতে কখনো নোবেল পুরষ্কার লাভের অভিনন্দন, কখনো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে অভিবাদন কোনোটিতে ভোজের নিমন্ত্রণও আছে। পত্র থেকে জানা যায়, জোড়াসাঁকোতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একসঙ্গে খেতেন এবং মেনুর মধ্যেও হিন্দুমুসলমানদের খাদ্য একই থাকত। কখনো 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকা নিয়েও আলোচনা আছে। কোনো কোনো চিঠিতে বিভিন্ন জেলার উপভাষাও নিয়ে আলোচনা আছে। কোথাও ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। যেমন- ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কৃষিতত্ত্ব সংক্রান্ত সভার আয়োজন করার প্রস্তাব বিষয়িত পত্র রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখেন।

এই পত্রগুলি থেকে শুধুমাত্র প্রেরক ও প্রাপকের মানসিক সম্বন্ধই নয়, চিঠিগুলি থেকে তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, কৃষিতত্ত্ব অর্থনীতি নানা বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

এছাড়াও রামেন্দ্রসুন্দর এবং রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ব্যক্তিগত চিঠিও সংযোজিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ এবং শ্যামাপ্রসাদ এই তিন নক্ষত্রই সমাজ উন্নয়নে সমান ভাবে ব্রতী। বিভিন্ন সামাজিক কাজে উদ্যোগী হবার জন্য এরা তিনজনেই নানা ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার ও সংস্কার এবং শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে লিখিত এদের পত্রগুলি থেকে শুধুমাত্র এঁদের মনের আদান প্রদানের হদিশ পাওয়া যায়- তাই-ই নয়, তৎকালীন শিক্ষাকাঠামো সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শান্তিনিকেতন স্থাপনের বিষয়ে এঁদের মত বিনিময় এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল। উমাপ্রসাদের কৃতিত্ব এই যে, এইসব দুস্প্রাপ্য চিঠি ও নথি— যে গুলি সাধারণভাবে পাঠকের সামনে কোনো ভাবেই গোচরে আসত না, সে গুলি উপস্থাপন করে নানা অজানা তথ্য পাঠককে জানিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট উপাধি দেবার কারণ, এইসব চিঠিগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে। আশুতোষের সঙ্গেঁ নানা বিষয় নিয়ে চিঠি লেখা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মেজো ছেলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরও চিঠিতে মত বিনিময় হত। এই প্রবন্ধে উমাপ্রসাদ এইরকম তেরোটি চিঠির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন— যেগুলির বেশীরভাগই ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা আছে। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ কবিতাও লিখে পাঠিয়েছেন— এগুলি কথাও উমাপ্রসাদ তুলে ধরেছেন।

তরুণ বয়সেই উমাপ্রসাদের সম্পাদনায় হাতে খড়ি হয়েছিল। বি.এ পড়া কালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে ম্যাগাজিন সম্পাদনার কাজ দিয়ে তিনি সম্পাদনায় হাত পাকিয়ে ছিলেন। ১৯২২ ও ১৯২৩ শিক্ষাবর্ষে উমাপ্রসাদ এই কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত একটি সংখ্যায় 'Welcome Rabindranath' রচনাটি (পৃ.১২-১৪) আছে। এছাড়াও আছে বিশেষ সংবাংদাতা প্রচারিত প্রতিবেদন 'Rabindranath in Presidency College' । এটি ১৯২২ এর ২১ শে আগষ্ট প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ভাষা সংক্রান্ত

লেখা এছাড়াও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা— The Chronical of a Walking Tour এবং Calcutta to Benaras on Cycle (দেবব্রত চক্রবর্তী) উমাপ্রসাদ সম্পাদিত ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। উমাপ্রসাদবাবু দিলীপকুমার রায়কে নিয়েও একটি লেখা লিখেছিলেন সম্পাদকীয়তে 'Old boy of Presidency College'। উমাপ্রসাদের সম্পাদনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্য পত্রিকা একটি স্বতন্ত্রতা অর্জন করতে পেরেছিল।

উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে বহু মানুষের যোগাযোগ ছিল। উমাপ্রসাদ নিজেও ছিলেন সদালাপী সহাস্য মানুষ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে উমাপ্রসাদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। পারিবারিক দিক দিয়েও শরৎচন্দ্রের অতীব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি।

এই সময় মুর্খাজ্জী পরিবারের উদ্যোগে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন থেকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ মাঘ) ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বেরোত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের-দাবী' র প্রকাশন প্রসঙ্গে উমাপ্রসাদ নিজেই লিখে গেছেনঃ

> 'আমার বড় দাদা ও মেজদা রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও প্রযত্নে আমাদের বাড়ি থেকে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। পিতৃদেব তখন বর্তমান। হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে আসীন। এ প্রচেষ্টায় তাঁরও সক্রিয় সহানুভূতি থাকে। .... আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে এ কাজে মেতে উঠি। সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনেরও অপূর্ব এক আর্কষণ ও আনন্দ থাকে।'[১১]

'বঙ্গবাণী'তে উমাপ্রসাদের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', (১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন), 'অভাগীর স্বর্গ', (১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ) ও 'পথের দাবী' বঙ্গবাণী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এরমধ্যে পনেরটি সংখ্যায় ছাপানো বাদ যায়। 'পথের দাবী'-র প্রকাশ নিয়ে শাসকমহল তোলপাড় হয়ে যায়। এর প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'বাণী বিনিময়' কবিতা এবং অবনীন্দ্রনাথের 'বাগীশ্বরী প্রবন্ধাবলী' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বিপিনচন্দ্র পাল, দিলীপকুমার রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, হরিহর শেঠ, বিনয়কুমার সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখদের নানা লেখা এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীদের আঁকা ছবি ও 'বঙ্গবাণী'তে ছাপানো হয়েছিল। 'বঙ্গবাণী'র প্রকাশনার কাজ উমাপ্রসাদ অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে পরিচালনা করতেন, রচনা সংগ্রহ, সম্পাদনা, প্রুফ দেখা, ছাপার কাজ সবই নিজে হাতে করতেন।

প্রকাশনার কাজ করতে করতে উমাপ্রসাদের শরৎচন্দ্র ও লেখকবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় সূত্রে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন তিনি। শরৎচন্দ্রের বৈষয়িক ও পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় উমাপ্রসাদ দেখতেন। এমনকি শরৎচন্দ্রের লেখার মূল পান্ডুলিপিগুলিও উমাপ্রসাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল। শরৎচন্দ্র গবেষক

গোপালচন্দ্র রায় যর্থাথই উমাপ্রসাদকে শরৎরচনার ভান্ডারী বলে অভিহিত করেছেন। উমাপ্রসাদ নীরবে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধের বিপুল ব্যয় ভার বহন করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে উমাপ্রসাদ একটি মহৎ সভার আয়োজন করেন (১৯৩৯ সালে) আশুতোষ কলেজে। এই সভায় গৃহীত ত্রিশ হাজার টাকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে শরৎচন্দ্রের নামে বার্ষিক বক্তৃতা দানের যে অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন উমাপ্রসাদ, তা এখনও বিদ্যমান এছাড়াও আরও বিপুল অর্থ সংগ্রহের জন্য। পরিচিত ও অপরিচিত বহুমানুষের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করেন। এই কারণেই উমাপ্রসাদ এক বাণিজ্য সংস্থার কর্তা এম.এ. এইচ ইসপাহানির সঙ্গে দেখা করেন এবং তিনি উমাপ্রসাদকে এক হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন এই শর্তে যে তাঁর নাম প্রকাশ চলবে না, কারণ মুসলিম ধর্মে দাতার নামোল্লেখ থাকে না। উমাপ্রসাদবাবু এঁনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বোর্ডে টাঙানো একটি বিখ্যাত উক্তি দেখে অত্যন্ত মোহিত হন। ইসপাহানি নিজে মুসলিম হয়েও তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু ধর্মের এক সাহিত্যিকের স্মৃতি তহবিলে টাকা দান করেন বলে উমাপ্রসাদ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এ ঘটনা নি:সন্দেহে অন্য মানুষদেরও আরো উদার করে তুলবে।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি তহবিল গড়ার জন্য তৎকালীন বিখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী কাননবালার কাছেও উমাপ্রসাদ অর্থসংগ্রহে গিয়েছিলেন। এই তথ্যগুলি থেকে উমাপ্রসাদকে আমরা নতুনভাবে চিনে নি- উমাপ্রসাদ সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েও অর্থসংগ্রহের জন্য কারুর কাছে হাত পাততে দ্বিধাবোধ করেন নি। উমাপ্রসাদের রসবোধও ছিল যথেষ্ট। তাই দেখা যায়, কাননদেবীর সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তিনি প্রথম দর্শনেই বলেছিলেন:

> 'নমস্কারের ভঙ্গিতে দুহাত জোড় করে, মৃদু হাসিমুখে বলি, আমি ব্রাহ্মণ সন্তান আপনার কাছে এসেছি ভিক্ষার ঝুলি হাতে।'[১২]

কাননবালা এক হাজার টাকা তাঁর ভিক্ষার ঝুলিতে দিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শরৎ সমিতি ১৯৮৮ সালে উমাপ্রসাদকে শরৎ পুরস্কার দান করে।

উমাপ্রসাদ শুধুমাত্র ভ্রমণেই উৎসাহী ছিলেন না, তিনি বেড়াতে গিয়ে ছবি তুলে আনতেন। ছবি তোলাতে তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। তাঁর ভ্রমণ বিবরণীর পাশাপাশি আমরা যদি তাঁর তোলা ছবিও দেখি, তবে তাঁর ঘোরা বিভিন্ন জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খানিকটা হলেও অনুধাবন করতে পারব। তাঁর ছবি তোলার সংখ্যা অসংখ্য। তাঁর নিজের তোলা সব ছবি এবং বেশ কিছু সংগৃহীত ছবি আশুতোষ মুখার্জ্জী মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউটের প্রদর্শনী কক্ষে সংগৃহীত আছে। তাঁর কাছে দু' একটি ভালো ক্যামেরাও ছিল। ১৯৩৪ সালে কৈলাস মানস সরোবরে বেড়াতে গিয়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা ব্যবহার করেন। এর আগে ব্যবহার করেছেন ভাইগল্যান্ডার ক্যামেরা। তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র শিবতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে একটা কন্‌টেসা ক্যামেরা উপহার দিয়ে ছিলেন, এটি শেষে শেষকিরণ সুরানাকে উপহার দেন। উমাপ্রসাদের সহপাঠী বন্ধু ইন্দুমাধব দাস জার্মানী থেকে তাঁর জন্য কোলিব্রি ক্যামেরা উপহার পাঠান। ছবি তোলার সুবাদে তৎকালীন নামকরণ ফোটোগ্রাফি কোম্পানী পেরেরার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। উমাপ্রসাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের সব ছবি নিয়ে দেবাশিস

দত্তের আহ্বানে ফোটোগ্রাফিক আর্কাইভস্ অফ ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৩ সালের ৭-১৩মে ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী প্রদর্শন কক্ষে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। দেবাশিষ দত্ত অনেক বুঝিয়ে এই প্রর্দশনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ প্রচারবিমুখ এই মানুষটি কখনোই রাজী হননি তাঁর ছবিগুলি প্রর্দশন করতে। শেষে এক শর্তে তিনি রাজী হনঃ

'আমার ছবির প্রর্দশনী করা চলবে না, বলতে হবে, উমাপ্রসাদের সংগ্রহে ভ্রমণের আলোকচিত্র প্রর্দশনী। (দেবাশিস দত্ত প্রচারিত একটি প্রচার পত্রের অংশ বিশেষ) এ সময় সংস্থার সভাপতি ডা: আবিরলাল মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত যে আমন্ত্রণপত্র প্রচারিত হয় ঃ

সবিনয় নিবেদন,

বিশিষ্ট হিমালয় পরিব্রাজক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রসতীর্থ পথের পথিক, রূপ বৈচিত্রের স্রষ্টা। তিনি তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপের আলোকে রাজাধিরাজের শুদ্ধতাকে যে অনির্বচনীয় বাক্যের সীমায় অবধারণ করেছেন। তা বংলা ভ্রমণ সাহিত্যের এক দুর্লভ সম্পদ এবং তা বঙ্গরসিকচিত্তের কাছে অজানা নয়। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই, উমাপ্রসাদের সংগ্রহে তাঁর ভ্রমণের যে বিপুল আলোকচিত্রের ভান্ডারটি রয়েছে, সেটিও তার লেখনীর মতো অতি সমৃদ্ধ, বৈচিত্রময়, তারই কিছু চয়ন করে আমরা একটি প্রর্দশনীর মাধ্যমে পরিব্রাজক, ঋষিতুল্য মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে প্রয়াসী।

আগামী শুক্রবার ৭ মে ১৯৯৩, জওহরলাল নেহেরু রোডস্থ(কলিকাতা-১৬) আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী হল এ (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম সংলগ্ন), বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এই প্রর্দশনী উদ্বোধন করবেন কলিকাতা পৌরসভার মেয়র মাননীয় প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন ড: প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

হিমালয়প্রেমী ভ্রমণপিয়াসী হিসাবে আমরা আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।
প্রীতি নমস্কারান্তে,

ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, ফোটোগ্রাফিক আর্কাইভস অব ইন্ডিয়া
কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৩'

প্রর্দশনীটিতে ১৯২৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত উমাপ্রসাদের তোলা মোট ৯২টি ছবি স্থান পেয়েছিল। ছবিগুলি থেকে তৎকালীন প্রকৃতির রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, যেগুলি কালের করাল গ্রাসে আজ সবই ধ্বংসপ্রায়। হিমালয়ের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের একটি আকর দলিল উমাপ্রসাদের ছবিগুলি। পথের দুর্গমতা, হিমালয়ের বিশালতা, বিভিন্ন চরিত্রের মুখ সবই তাঁর ক্যামেরাবন্দী হয়েছিল। উমাপ্রসাদের ছবি গুলি ডকুমেন্টারি

হিসাবে অন্যান্য লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছবি এবং প্রামাণিক তথ্য সম্বলিত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উমাপ্রসাদ একজন অতি দক্ষ আলোকচিত্রকর। ছবি তোলার যা যা প্রধান বিষয় এবং প্রকরণের নানা খুঁটিনাটির পরিচয় উমাপ্রসাদের ছবির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। ছবি তোলার ক্ষেত্রে আলোর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। উমাপ্রসাদের ছবিতে আলোর ব্যবহার ও ডিটেলসের কারুকাজ লক্ষণীয়। উমাপ্রসাদ অত্যন্ত যত্নশীলও বটে, তাঁর মতো ভবঘুরে মানুষ প্রায় সত্তর বছর ধরে তোলা ছবির নেগেটিভ যত্নসহকারে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন যা পরবর্তীকালের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান দলিলও বটে। উমাপ্রসাদের হিমালয় সংক্রান্ত তোলা ছবিগুলি আলোকচিত্রে 'হিমালয়' নামে বইটিতে একত্রিত আছে। উদ্যোক্তা ছিলেন এক্সেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (বম্বে) ১৯৯৩। উমাপ্রসাদ ট্রেকিং করতে শুধু ভালোইবাসতেন না, তিনি ট্রেকিং এর জন্য মানুষজনকে উদ্বুদ্ধও করতেন। আর সেজন্যই ১৯৬০ সালে ১২ই আগষ্টে আশুতোষ কলেজে হিমালয় প্রেমীদের যে সভা আহূত হয় তাঁর প্রধান হোতা ছিলেন উমাপ্রসাদ। তিনি এখানে হিমালয়প্রেমীদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ার প্রস্তাব দেন এবং এর সদস্যপদের নূন্যতম যোগ্যতা হিসাবে অন্তত একবার হিমালয় ভ্রমণ আবশ্যিক বলে প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। বিরোধীদের বক্তব্য যারা শারীরিক কারণে হিমালয়ে যেতে পারেন নি, তাঁরা কি হিমালয়প্রেমী নন, যাইহোক শেষে বিরোধীদের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা আর আজীবন সদস্যপদের জন্য কুড়ি টাকা নির্ধারিত হয়। এই সংস্থার নামকরণ হয় হিমালয়ান ইন্সটিটিউট। এর প্রথম সভাপতি হন উমাপ্রসাদ, সহসভাপতি প্রবোধকুমার স্যানাল এবং সম্পাদকের ভার নেন সুকুমার রায়। এরপর ১৯৬১ সালে জওহরলাল নেহেরুর লিখিত অনুরোধে এই সংস্থার নাম হয় হিমালয়ান এ্যসোসিয়েশন'। এবারও সভাপতি পদে থাকেন উমাপ্রসাদ। ১৯৬২ সালে এই সংস্থার পক্ষ থেকে অমূল্য সেনের নেতৃত্বে নীলগিরি অভিযান হয়।

শেষকিরণ সুরানা এইসময় উমাপ্রসাদের সফরসঙ্গী হন। এরপরের বার নন্দাঘুন্টি অভিযানে শেষকিরণ সুরানাকে বাঙালি না হওয়ার জন্য বাদ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ উমাপ্রসাদ পদত্যাগ করেন এবং সম্পাদকের পদ থেকে সুকুমার রায় সরে দাঁড়ান। উমাপ্রসাদের নেতৃত্বে এরপর গড়ে ওঠে অভিযাত্রী সংঘ নামে একটি সংস্থা। হিমালয়ান এ্যসোসিয়েশনের সঙ্গে তিনি আর কোনো রকম যোগাযোগ রাখেন নি।

উমাপ্রসাদ ছিলেন বৈঠকী মানুষ। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যা মজার ঘটনা ছিল সেগুলি পাঠকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারলে বোধ হয় তাঁরও শান্তি হত না। এমন কিছু কিছু ঘটনা তিনি জানিয়েছেন সেগুলি পড়লে দম ফাটা হাসির উপক্রম হয়। 'হজমী জল' এমনই এক পেট ফাটানো হাসির উপকরণ।

উমাপ্রসাদ তখন আলিপুর কোর্টের উকিল। গিরীশবাবু ছিলেন সেখানকার নামকরা উকিল। কিন্তু স্বভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ। তাঁর কৃপণতার কিছু নির্দশন উমাপ্রসাদ তুলে ধরেছেন। একবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে তিনি গিরীশবাবুর কাছ থেকে ডোনেশান বাবদ দশ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। আরেকবার গিরীশবাবু তাঁর ছেলের বিয়েতে তাঁর ছেলেরই শিক্ষককে নিমন্ত্রণ করা তো দূরে থাক্, উপরন্তু বলে ছিলেন :

'ওহে! শুনেছ নিশ্চয় তোমার ছাত্রের যে বিয়ে। অমুক দিন তাঁর বৌভাত, বাড়িতে সেদিন খাওয়ানো দাওয়ানোর হাঙ্গামা। তুমি সেদিন যেন তাকে পড়াতে এস না। এবার তোমাকে নেমন্তন্ন করলাম না, এর পরের বার কোন অনুষ্ঠান হলে তাতে বলব।'[১৩]

শুধু ঘটনাটা মজাদারই নয়, লেখকের বলার তা আরো আস্বাদ্যমান হয়ে ওঠে।

আরো একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন উমাপ্রসাদ। মধুপুরে গিরীশবাবুর বাড়িতে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন আলিপুরের আরেক উকিল দেবেনবাবু। বিজয়াতে মিষ্টি মুখের বদলে কীভাবে কুয়োর জল খেয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলেন তারই ইতিবৃত্ত এখানে জানিয়েছেন। ঘটনার মধ্য দিযে নিরীশবাবুর একটি চরিত্র আমাদের সামনে অঙ্কিত হয়ে যায়। প্রবন্ধটি অত্যন্ত চিন্তাকর্ষক ও নির্ভেজাল মজার।

উমাপ্রসাদ স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত অন্তর্মুখী এবং চাপা স্বভাবের। তিনি সহজে নিজের অনুভূতি যেমন প্রকাশ করতেন না, তেমনি কখনোই কোনো কিছু পাবার আশায় নিজেকে মেলে ধরেন নি। কিন্তু ফুল ফুটলে যেমন তাঁর সুরভি আপনা থেকেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি উমাপ্রসাদের কৃতিত্বও চাপা পড়ে তাঁর থাকে নি, পাঠক সমাজ তার লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁকে চিনে নিতে একটুও ভুল করেনি। ছাত্র জীবনে বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন উমাপ্রসাদ। পরবর্তী জীবনে সাহিত্যরচনাতেও সম্মান পেয়েছেন। ১৯৮৮ সালে শরৎ সমিতি তাঁকে শরৎ পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৭১ সালে উমাপ্রসাদ সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পান 'মণিমহেশ' গ্রন্থ রচনার জন্য। এই পুরস্কার প্রথমে তিনি নিতে চাননি। আনন্দবাজার পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে (পত্রিকা, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৯৩) অদ্রীশ বিশ্বাসকে তিনি জানিয়েছেনঃ 'কারণ আমি পুরোপুরি লেখক নই এবং এসব বিশেষ পছন্দও করি না। তবুও নিলাম, না হলে লোকে বলবে, এই লোকটাকে দেওয়া হল, তবু দেখ, ভারী 'ইয়ে' হয়েছে, প্রত্যাখান করে নাটক করলে। তার চেয়ে নেওয়া ভাল'। কী অসাধারণ সহজ সরল ব্যক্তি ছিলেন উমাপ্রসাদ, তা তাঁর এই মন্তব্যতেই পরিস্ফুট হয়। সংবেদনশীল অথচ প্রচারবিমুখ মানুষটি সত্যিই আমাদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা।

উমাপ্রসাদের গৃহিনীপনা আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। অকৃতদার মানুষটি ছিলেন যথেষ্ট সংসারী। কিন্তু সংসারে থেকেও সংসার সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত। বার্ধ্যক্যে তিনি জাগতিক নানা সমস্যা সম্পর্কেও অত্যন্ত উদাসীন থাকতেন নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার জন্য খবরের কাগজ পড়াও একসময় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

উমাপ্রসাদ সংসারে থেকেও সন্ন্যাস জীবনযাপন করতেন। তিনি বরাবর নিজে হাতে রান্না করে খেতেন। তাঁর হাতের রান্নাও অত্যন্তসুস্বাদু। তিনি বরাবরই নিরামিষাশী। নিরামিষ পদগুলি রান্নাও করতেন অসাধারণ। এ প্রসঙ্গে অন্যতম সাহিত্যিক সত্যেন্দ্র কুমার মিত্র জানিয়েছেনঃ

'উমাপ্রসাদের হাতে তাঁর স্বপাক রান্নার স্বাদ ও তৃপ্তি আমারও জিভে লেগে আছে। সুক্তো থেকে শুরু করে শেষ পাতের অম্বলটুকু পর্যন্ত তিনি রান্না করতে জানতেন। চোখ বুঁজে খেলেও বোঝা যাবে কার রান্না খাচ্ছি। সবটাই নিরামিষ। উমাবাবুর হাতের রান্না খাওয়ার

সৌভাগ্য যার হয়নি। তিনি জানতেই পারলেন না তার স্বাদ কেমন ছিল, যা আজও আমাদের মুখে লেগে আছে।'[১৪]

তাঁর ভ্রামণিক জীবনেও তিনি নিজে হাতে রান্না করেছেন, খেয়েছেন এবং খাইয়েছেন তাঁর সঙ্গী সাথীদের। তিনি পায়েস খেতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। নিজে নিরামিষাশী হলেও, আমিষ রান্নাও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে রান্না করতে পারতেন উমাপ্রসাদ। ভাইপো চিত্ততোষবাবুর মেয়ের বিয়ের খাওয়ানোর দায়িত্বভার ছিল উমাপ্রসাদের উপর। নাতনির এই বিয়েতে তাঁর তত্ত্বাবধানে রান্না অত্যন্ত সুস্বাদু হয়েছিল।

শ্রদ্ধা- পূজা আত্মনিবেদমেয় ভ্রামণিক জীবনে তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভ্রমণকে যাঁরা ব্যবসায়িক গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চেয়েছেন তাদেরকে অত্যন্ত দূরে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। বেড়ানোর পরিবেশকে যারা কলুষিত করতে চেয়েছে তাঁদেরকে উপেক্ষা করেছেন বরাবর। যাঁরা বেড়াতে ভালোবাসেন তাঁদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতেন, কখনো নানা উপদেশ দিয়ে। কখনোবা নিজের ভ্রমণসঙ্গী করে নিয়ে, কখনো অর্থ সাহায্য করে। এমন ভ্রামণিক হাজারে একটা মেলা ভার।

উমাপ্রসাদ ছিলেন সুদক্ষ ব্যবস্থাপক। তাঁর সব কাজই নিখুঁত পরিষ্কার পরিপাটি। সময় সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এই মানুষটি শৃংখলাপরায়ণও ছিলেন। যেকোনো কাজের মূল দায়িত্বে থেকেও কখনোই লোকসমক্ষে আসতেন না এই প্রচারবিমুখ মানুষটি। উমাপ্রসাদের বহুলোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখতেন, বড়ো মাপের মানুষ থেকে অতি সাধারণ মানুষও তাঁর চিঠির প্রাপক ছিলেন। চিঠিপত্র লেখাতেও অত্যন্ত সর্তক ছিলেন- বানান ভুল হবার ভয়ে সব সময়তেই হাতের কাছে অভিধান রাখতেন।

১৯৯৭ সালের ১২ই অক্টোবর বিজয়দশমীর দিন মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের জন্য রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন এবং এদিনই সকাল ১০.৩০ টায় তাঁর মৃত্যু হয়। ৯৩তম জন্মদিনের দিনই তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত হন। এদিন বিকেলে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি চিঠিতে জানিয়েছেন উমাপ্রসাদের শেষ দুটি ইচ্ছার কথা, তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় যেন ফুল দিয়ে সাজানো না হয় এবং তিনি নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে গেছেন তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান যেন আর করা না হয়। কিন্তু তাঁর এই দুটি ইচ্ছার কোনোটাই পূর্ণ হয়নি।

পাদটীকা:

১. অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (সম্পা:) /১৯৮৯/ অ্যালবাম পুনশ্চঃ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১ম সংস্করণ)/ কলিকাতা/ আনন্দ পাবলিশার্স / পৃষ্ঠা-১১।
২. তদেব/ পৃষ্ঠা-২১।
৩. তদেব/ পৃষ্ঠা-১৩।
৪. তদেব/ পৃষ্ঠা-১৪।
৫. তদেব/ পৃষ্ঠা-১৪।
৬. তদেব/ পৃষ্ঠা-২৯।
৭. তদেব/ পৃষ্ঠা-২৫।
৮. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি, আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট/ ১৪১০ বঙ্গাব্দ/ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: ১৯০২- ১৯৯৭/ কলিকাতা/ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ/ পৃষ্ঠা-৮।
৯. অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (সম্পা:) / প্রাগুক্ত/ পৃষ্ঠা-২৪।
১০. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি, আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট/ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১০৭।
১১. তদেব/ পৃষ্ঠা-৩৪।
১২. অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (সম্পা:) / ১৯৮৯/ দুটি স্মরণীয় সাক্ষাৎকার, অ্যালবাম পুনশ্চ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়/ কলিকাতা / আনন্দ পাবলিশার্স/ পৃষ্ঠা-৮৬।
১৩. তদেব/ পৃষ্ঠা-৯০।
১৪. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি, আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট/ প্রাগুক্তপৃষ্ঠা-৫৫।